

চিকিৎসা জগতে বায়োটেক বিপ্লব: নীরোগ পৃথিবীর হাতছানি মুশতাক ইবনে আযুব

রোগ-ব্যাধির সাথে নিত্য বসবাস মানুষের। সুন্দর পৃথিবীটা হঠাৎ হঠাৎ যন্ত্রনাময় হয়ে ওঠে জানা অজানা অসুখের অলক্ষ্য আক্রমণে। তাই বলে মানুষও থেমে নেই এই রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কৌশলে চলছে বেঁচে থাকার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সর্বশেষ অস্ত্র বায়োফার্মাসিউটিক্যালস। প্রথমেই জেনে নেয় যাক-

কি এই বায়োফার্মাসিউটিক্যালস

বায়োফার্মাসিউটিক্যালস শব্দটি নিজেই নিজের পরিচয় বহন করছে। শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় বেরিয়ে আসে- বায়ো এবং ফার্মাসিউটিক্যালস। তার মানে চিকিৎসা কাজে যেসব বায়োলজিক্যাল উপায় উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাই বায়োফার্মাসিউটিক্যালস। অতীতে বেশীরভাগ চিকিৎসাপোষণ ছিল সংশ্লেষিত রাসায়নিক উপকরণ। এখন সে জায়গা দখল করে নিচ্ছে বায়োফার্মাসিউটিক্যালস। রাসায়নিক চিকিৎসাপোষণের চেয়ে বায়োফার্মাসিউটিক্যালসের সুবিধা হচ্ছে শরীরে এর গ্রহণযোগ্যতা। যেহেতু, জৈব উপকরণ দিয়ে তৈরী তাই সহজেই শরীরের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে বায়োফার্মাসিউটিক্যালস, যা রোগীকে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখে। অনেকেই ভাববেন ভেষজ উপকরণও তো তাহলে এক ধরনের বায়োফার্মাসিউটিক্যালস। ঘটনা মিথ্যে নয়। তবে এখন যেসব জৈব চিকিৎসাপোষণের কথা বলছি সেগুলো আসলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের শরীরেরই উপাদান। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো প্রোটিন, বা ক্ষুদ্র পলিপেপটাইড চেইন বা এমাইনো এসিড এবং খুব অল্পক্ষেত্রে কিছু নিউক্লিওটাইডস।

বায়োফার্মাসিউটিক্যালস কাজ করে মলিকুলার লেভেলে। এ কারণে কোন রোগকে সমূলে শরীর থেকে উৎখাত করতে এর জুড়ি নেই। এখন ভাবা হচ্ছে আসছে পৃথিবীতে বায়োফার্মাসিউটিক্যালসই হতে যাচ্ছে দূরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দারুণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা এখন ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ চিকিৎসা ক্ষেত্রের বুনিয়াদ রচনা করছে। এখানে আমরা বর্তমানে অর্জিত বিভিন্ন অগ্রগতির কিছু খন্ডচিত্র তুলে ধরব।

রোগ নির্ণয়ে বায়োফার্মাসিউটিক্যালস

রোগের চিকিৎসার আগে তা নির্ণয়ের উপায় প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি আছে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য। তবে এসব ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা হচ্ছে আপনি ততক্ষণ রোগের অস্তিত্ব ধরতে পারছেন না যতক্ষণ না রোগের উপসর্গ প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ, এই রোগটি যখন প্রথম আপনার শরীরে জায়গা করে নিচ্ছিল তখনই কিন্তু শরীরে কিছু পরিবর্তন শুরু হয়েছিল যা বুঝতে পারলে একেবারে প্রাথমিক অবস্থাতেই রোগটি সনাক্ত করা সম্ভব হত। কিন্তু প্রচলিত রোগ নির্ণয় ব্যবস্থায় এ কাজটি করা যায় না। তাই আমরা রোগের খবর পাই তখনই যখন ইতোমধ্যেই রোগটি পাকাপাকিভাবে শরীরে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

বায়োফার্মাসিউটিক্যালস হতে পারে এ সীমাবদ্ধতার আগল ভাঙার প্রথম পদক্ষেপ। বর্তমানে বেশ কিছু টেকনিকের সাথে বিজ্ঞানীর পরিচিত হয়েছেন যা আমাদেরকে এ কাজে সাহায্য করতে পারে। এমন একটি বিষয় হচ্ছে প্রোটোমিক্স। এ পদ্ধতি আমাদেরকে কিছু মার্কার বা সনাক্তকারী টুলস দেবে যা কোন রোগকে তার সূচনালগ্নেই চিহ্নিত করবে তার কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হবার আগেই।

বর্তমানে যে হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট চলছে তার কাজ শেষ হলে মানুষের বিভিন্ন জেনেটিক রোগ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য হাতে আসবে বিজ্ঞানীদের। এসব তথ্য ব্যবহার করে ডায়বেটিস, আলঝেইমার, পারকিনসন ইত্যাদি রোগের একেবারে প্রাথমিক অবস্থাও জানা যাবে। তখন আর এদের উপস্থিতি জানার জন্য এসব রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কোন মানুষের জেনেটিক ম্যাপ দেখেই বলে দেয়া যাবে এসব রোগে তার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কতটুকু, আর কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে এদের হাত থেকে।

এতো গেল এক ধরনের ব্যাপার- রোগ নির্ণয়ে দ্রুততা এবং সঠিকতা প্রদানেও বায়োফার্মাসিউটিক্যালস আনতে যাচ্ছে অভাবনীয় অগ্রগতি। একেবারে কাছের উদাহরণ হচ্ছে হোম প্রেগন্যান্সি টেস্ট। বাসায় বসে প্রেগন্যান্সি টেস্টের যে সহজলভ্য পদ্ধতিটি এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় তার উপকরণ কিন্তু বায়োফার্মাসিউটিক্যালস। এছাড়া স্ট্রেপ থ্রোট সহ বেশ কিছু সংক্রমণ রোগের ডায়াগনসিসও এখন হতে মাত্র কয়েক মিনিটে করা যায় বায়োফার্মাসিউটিক্যালস ব্যবহার করে।

রোগ নির্ণয়ে খরচের পরিমাণও কমিয়ে দিয়েছে বায়োফার্মাসিউটিক্যালস। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল LDL পরিমাণ নির্ণয়ের টেস্টের কথা। অতীতে রক্তে LDL -এর পরিমাণ মাপা ছিল এক বিরাট ঝামেলার কাজ। যেমন, ১২ ঘন্টা উপোষ থেকে রক্তের নমুনা সম্পূর্ণ কোলেস্টেরলের পরিমাণ নির্ণয়, তারপর স্টোরজ চর্বি ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ নির্ণয়, উপকারী কোলেস্টেরল HDL-এর মাত্রা নির্ণয় এবং এতসব টেস্টের পর LDL-এর পরিমাণ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌছা। এসব টেস্টের যেকোন একটি টেস্টে গড়বড় হলে পুরো ব্যাপারটাই একটা ভুল সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে শেষ হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা এখানে খরচের পরিমাণটা নেহাত বেশী।

অথচ, বায়োফার্মাসিউটিক্যালস ব্যবহার করে সরাসরি LDL -এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এর জন্য না লাগবে অন্য কোন টেস্ট আর না লাগবে ১২ ঘন্টার উপোষ। এখানে খরচের পরিমাণ যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি কমে যাচ্ছে নানা ঝামেলা। এখনতো প্রোস্টেট কিংবা জরায়ুর ক্যান্সার টেস্টের মতো জটিল কাজও করা যাচ্ছে রক্ত নমুনা পরীক্ষা করে যা কিনা আগে করতে হত রীতিমত অস্ত্রপচার করে।

বায়োফার্মাসিউটিক্যালস ব্যবহারের সুবিধা শুধু রোগ নির্ণয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং রোগ নির্ণয়ের ব্যয়ভার কমানো এবং একে রোগীর যথাসম্ভব কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করছে এ প্রযুক্তি। এমনকি বেশীরভাগ পরীক্ষণ পদ্ধতিই এমন সহজ যে এর জন্য উচ্চ দরের টেকনিশিয়ান বা বিশেষজ্ঞও দরকার হয় না। তাই গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত রোগীদের জন্য আশীর্বাদরূপে বিবেচিত হচ্ছে বায়োটেকনোলজি ভিত্তিক রোগ নির্ণয়পদ্ধতি।

রোগ নিরাময়ে বায়োফার্মাসিউটিক্যালস

এতক্ষণের আলোচনার মূল কথা ছিল রোগ নির্ধারণে বায়োফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবহার। এবার তাহলে নজর দেয়া যাক রোগ নিরাময়ের দিকে। ইতোমধ্যেই বায়োফার্মাসিউটিক্যালস ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগের সফল চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রক্তশূণ্যতা, রক্তাশ্রুতা, দৈহিক বৃদ্ধি জনিত সমস্যা, হিমোফিলিয়া, আর্থ্রিটিস, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ থেকে শুরু করে ক্যান্সার পর্যন্ত।

বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহার করে উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন বায়োফার্মাসিউটিক্যালস। যেমন, উকুন থেকে সংগৃহীত হতে পারে রক্তজমাটবদ্ধতা প্রতিরোধকারী উপাদান, বিষাক্ত ব্যাঙ হতে পারে পেইন কিলারের উৎস। সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গেছে এক ধরনের ছত্রাকের যা টিউমার তৈরীর জন্য দায়ী সুপার অক্সাইডের উৎপাদনকে প্রতিহত করতে পারে অত্যন্ত সফলতার সাথে। তবে বিবিধ চিকিৎসাপ্রদানের সবচেয়ে বড় উৎস হতে যাচ্ছে বোধকরি সমুদ্র। সমুদ্রের আগাছা থেকে শুরু করে শামুক পর্যন্ত সর্দি-কাশি থেকে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কার্যকর বিভিন্ন উপকরণের উৎসে পরিণত হয়েছে। আর একারণেই মেরিন বায়োটেকনোলজিস্টরা মানুষকে সন্ধান দিতে পেরেছেন এমনসব সমুদ্র জীবের যাদের থেকে সংগৃহীত উপাদান ক্ষত নিরাময় করতে পারে, টিউমার ধ্বংস করতে পারে, ইনফ্লুয়েন্সারোধ করতে পারে, পারে শরীরের বিভিন্ন ধরনের ব্যথা নিরাময় করতে।

মানুষের অনেক রোগ আছে যার জন্য দায়ী তার শরীরের কোন ত্রুটিপূর্ণ জিন। এসব জিনকে ঠিক করার জন্য বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন জিন থেরাপি। জিন থেরাপির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মাধ্যমে টার্গেট রোগটিকে ভাল করা যায় শরীরের মৌলিক প্রক্রিয়া শুরুর আগবিক লেভেলে। ২০০৩ সালে চীন সর্বপ্রথম জিন থেরাপির বাণিজ্যিক ছাড়পত্র প্রদান করে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য। জেনডিসিন নামে বাজারজাতকৃত P53 tumor suppressor জিনটি মাথা এবং ঘাড়ের ক্যান্সার নিরাময়ে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখায়। দেখা যায়, মাসে দুবার জেনডিসিন ব্যবহার ৬৪% রোগীর মধ্যে ক্যান্সারের বিস্তার সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করেছে আর ৩২% রোগীর মধ্যে আংশিকভাবে।

এখনই জিন থেরাপি যদিও সব অসুখের বিরুদ্ধে খুব একটা কার্যকর করা যায়নি কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল ডিভাইসও এখন পাওয়া যাচ্ছে জৈব উৎস থেকে। যেমন, অস্ত্রপচারের পর ব্যবহৃত ব্যান্ডেজের কাপড়, রক্তপাত বন্ধের জন্য পট্রি, ব্যান্ডেজ বাধার জন্য প্রাকৃতিক এডহিসিভ ইত্যাদি।

এতক্ষণের আলোচনায় যে বড় একটি বিষয় উপেক্ষণীয় ছিল তা হচ্ছে ভ্যাকসিন বা টিকা। টিকা মানুষের জীবন রক্ষায় এক অবিচ্ছেদ্যীয় অবদান রেখেছে এবং রেখে চলছে। টিকা উৎপাদনের আধুনিক অগ্রগতির নবতর সংযোজন ডিএনএ ভ্যাকসিন। এতদিন শুধু জীবাণুর মূত্ররূপ বা অংশ বিশেষ ব্যবহার করে উদ্ভাবিত হত ভ্যাকসিন। এখন সে যাত্রায় শরীর হয়েছে ডিএনএর নামও। AIDS, ম্যালেরিয়া এবং ইনফ্লুয়েন্সার বিরুদ্ধে উদ্ভাবিত ডিএনএ ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

নীরোগ পৃথিবী কতদূর.....

উপরের আলোচনা থেকে পাঠকের মনে কি কোন আশার সঞ্চার হয়েছে একটি রোগ শোকহীন পৃথিবী পাওয়ার ক্ষেত্রে? একটি নীরোগ পৃথিবী কি আদৌ পাওয়া সম্ভব? সেটাও একটা প্রশ্ন। কারণ, রোগ চিকিৎসার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি যত হাতে আসছে মানুষের ততই বেড়ে যাচ্ছে নতুন রোগের প্রকোপও। তাই পুরোপুরি আশ্বস্ততা হওয়া যাচ্ছে না। তবে এটা ঠিক কোন অসুখের বিরুদ্ধে অসহায় আত্মসমর্পণও করতে হচ্ছে না। সেটাও একটা ভরসার কথা। সুতরাং জড়া-ব্যাধিমুক্ত একটি পৃথিবী হয়ত পাওয়া সম্ভব নয় তবে যত কঠিন অসুখই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে লড়াই করার সামর্থ্য অর্জন করা সম্ভব। সেটাই বা কম কি।

শেষ কথা

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০০ বায়োফার্মাসিউটিক্যালসের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে। এসব ওষুধকে তৈরী করা হচ্ছে ২০০ রোগকে টার্গেট করে। যারা মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, আলজেইমার ডিজিস, ডায়বেটিস, এইডসের মতো বহুল প্রচলিত অসুখ। বিশ্বব্যাপী বায়োফার্মাসিউটিক্যালসের চাহিদা বেড়েই চলছে, বেড়েই চলছে এর গ্রহণযোগ্যতা। অদূর ভবিষ্যতে এসব ওষুধই হয়ত হয়ে ওঠবে মানুষের প্রধান অবলম্বন।